শেহেদ আহমেদের উপত্যকায়

অরুন্ধতী রায়চৌধুরী

জরথুষ্টের মতো প্রাচীন প্ল্যাটফর্মটা। যেখানে সেখানে পলেস্তরা খসে পড়েছে ইচ্ছামৃত্যুর মতো। পৃথিবীর আদিম উচ্ছ্বাসে কোথাও কোথাও ধ্বসে গেছে ছোট লাল ইটের গাঁথুনি। সময় নাগাল পায় না এই জায়গাটার। চারিদিকে তাকালে মনে হয়, এ যেন ভাবী পৃথিবীর মানচিত্র নির্মাণের আয়োজন চলছে। এখানে বৃষ্টি শ্বাস প্রশ্বাসের মতো প্রাণের সহচর। শীতের কুয়াশা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আসার আগে পর্যন্ত পাহাড়ি ধাপে মিলেট আর সামান্য আলুচাষ হয়। কুড়ি বছর আগে পর্যন্ত এখানে ধাতুবদলের খোঁজ মিলত না। এখন শীতের শেষ বৃষ্টির হাত ধরে হঠাৎই একদিন রোদ্দুর আসে, ফুল ফোটে সারা উপত্যকা জুড়ে। আজও সারাদিন কুয়াশার পশমিনা আবক্ষ টেনে নিয়েছে সবুজ পাহাড় দুটো। ওদের অপত্য স্নেহে শিরিন নদীটা খোলামকুচি খেলতে খেলতে কার সঙ্গে যেন দেখা...করতে যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত বিকেলটায় বৃষ্টির হাত ধরে রোদ আসবে... বোধহয় সেই গল্পটাই বলতে যাচ্ছে শিরিন, এখন ও আর কোনো গল্প শুনবে না। এই খবরটা শিরিন ছাড়া টের পেয়েছে আরেকটা মানুষ, শেহেদ আহ্মেদ।

ছোট্ট কেবিন ঘর থেকে বেরিয়ে ঝরঝরে সাইকেলটা টিনের শেডের নীচে এনে রাখল স্টেশান মাস্টার শোহেদ আহমেদ ওপরের টিনটার দিকে তাকালে মনে হয় কত তারা খাসিয়েও নিজের ইচ্ছে বুনছে সারা শরীর জুড়ে। শোহেদ আহ্মেদ সাইকেলটার দিকে মায়া ভরা চোখে তাকিয়ে ছিল, ছোটবেলা থেকে এই দুটি পাহাড়ের প্রনয়কল্পে তাঁর বড় হয়ে ওঠা, বুড়ো হয়ে যাওয়া। সাইকেলটা দীর্ঘদিন ধরে তাঁর মনের চড়াঁই উৎরাই পার করে দিয়েছে। আজ সময় হয়েছে শেহেদ আহমেদের গল্প বলার। আজই তাঁর গল্পের শ্রোতা আসবে...শিরিনের মতো সে-ও টের পায় কতকগুলো আগমন। এই দীর্ঘ কুড়ি বছর শেহেদ মিঞা নিঃশব্দ ছিল। কেবিনে যেতে যেতে গল্পের একদম প্রথম পাতার প্রথম লাইনটায় আঙুল রাখল শেহেদ আহমেদ-মাশুকাকে প্রথম দেখেছিল সে অন্ধকার পাহাড়ি পথে। মৃদু আলোর লন্ঠনটা মেয়েটার ঘন নিশ্বাসে বড়ও মায়াবী হয়ে উঠেছিল। পাহাড়ি পাকদন্ডী বেয়ে সে চলেছিল হেরিং সাহেবের পুরনো বাংলোয়। ওই পাহাড়ে সাহেবের বাংলোটাই সবচেয়ে উঁচুতে, তার পরে আর বসত নেই। ভাঙা চোরা হলেও বেশ বড়ো কাঠের দোতালা বাড়ি। সেখানে একলা থাকতে হতো মাশুকাকে। ওর আসল নামটা জানা হয়নি কোনোদিন। শেহেদ তাকে ওই নামই দিয়েছিল মনে মনে। এই উপত্যকায় মাশুকার নির্বাসন হয়েছিল। শেহেদ আহমেদ তখন স্টেশান মাস্টার হয়নি, তাঁর বাবা ছিলেন তখন স্টেশান মাস্টার। শেহেদ ছিল অনেকটা গাইডের মতো। না এখানে কেউ বেড়াতে আসতে পারে না, আসে নির্বাসনে। শেহেদের কাজ ছিল নির্বাসিতকে তার গন্তব্যে পৌঁছানো। মাশুকার আগে, হেরিং সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত কারো নির্বাসন হয়নি। উপত্যকার পাঁচটি ঘর বরাদ্দ ছিল সাধারণ নির্বাসিতদের জন্য, তাতেই কুলিয়ে যেত। নির্বাসনের দিনক্ষণ মেয়াদ এসব খবর আসত বাবার কাছে। বাবাও যে সময়ের দেশের ওই জটিল হিসেব খুব একটা ভালো বুঝত, তা নয়। আসলে এই উপত্যকায় কেউ সময় গোনে না, অন্য কিছু গোনে। মাশুকার অপরাধ বুঝি ছিল খুব গুরুতর। সময়ের দেশ থেকে পাতা ঝরার মতো আদেশ নামা, সনদ, মেয়াদ বৃদ্ধির পরোয়ানা ঝরে পড়ত তাদের এই বুননের উপত্যকায়। মাশুকা নাকি ওদের সময় মানত না, মানত না সরকারি নিয়ম। ঘরে বাইরে কোথাও বুঝি নিজেকে আটকাতে পারত না ও – শেহেদের শিরিন নদীর মতো। শিরিনকে বাঁধ দেওয়া যায় না, এত এঁকে বেঁকে চলে। ইচ্ছে মতো মোড় ঘুরে কখনও আবার শান্ত হয়ে যায়। অথচ শান্ত শিরিনকে খুব কম লোক চিনত। সবাই দেখত শিরিন কল্‌কল শব্দ করে অনর্গল...ওর শব্দ হাসে কাঁদে কথা কয়...আরও কত কী / বলে যে করে পাগলামো। মাশুকার সময়ের দেশে ওসব বারণ হয়ে গেছে তখন। ঘোষণা ছিল না তবে বারণ ছিল। বারণ শুনতে পেত না মাশুকা। তাই তো ওর পরিবার, আত্মীয় স্বজন, কর্মস্থল মিলিয়ে বারোজন বিরক্ত হয়ে উঠলে মামলা আপনিই উঠল এজলাসে। মাশুকার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল ছত্রিশজন। সাক্ষীদের আদালতে আসতে হয় না, মনে মনে বয়ান ভাবলেই চলে। ছত্রিশটা বয়ানে মাশুকা চোদ্দ বছর ধরে হেরিং সাহেবের বাড়িতে নির্বাসিতা। ওর নাকি পনেরো বছর নিবাসনের কথা ছিল, কেউ একটা বয়ান দেয়নি। বহু পরে তার কথা শুনেছিল শেহেদ। মাশুকা একটা করে বছর নির্বাসনের মেয়াদ বাড়িয়েছে, আজও তার নির্বাসন শেষ হয়নি। শিরিনের মতো স্বভাব ওর কথা শোনে না, ঢেউ শোনে, জলের শব্দ শোনে, ফুলফোটার স্পন্দনটাও শুনতে পায় ও। ওদের সঙ্গেই কথা বলে যায়। শেহেদ আহ্মেদের উপত্যকায় ভাষার বালাই নেই। কথাবন্দীদেরই পাঠানো হয় এখানে নির্বাসনে। মাশুকা বোধহয় কথা দিয়েই ঘর বেঁধেছে। ভেঙেছে। পাগল করেছে। কষ্ট দিয়েছে। যা করেছে সব কথা দিয়ে, তাতে কেউ সন্তুষ্ট হয়নি ওর ওখানে –ওকে এজলাসে নিয়ে গেছে। শেহেদ আহ্মেদ নিজের মনেই হাসে...নসিব হয়। সেই ওযাক্ত ওয়াতন থেকে এখানে আসে নির্বাসিতেরা। মেয়াদ ফুরোয় সেই খানে যেখানে সময় বাস করে...মেয়াদ শেষে ফিরে যায় সময়ের কাছে। শুরু মাশুকার মেয়াদ ফুরোয় না, বেড়েই চলে – সময়ের সঙ্গে

ওর বনিবনা নেই। শিরিন আর মাশুকার মাঝে বুঝি দুমুখো আয়না আছে। এখানে যখন শীতের গা ঘেঁষে বরফ পড়ে...কুঁচো বরফ...শিরিন বরফকে রোজ চান করিয়ে দেয় কল্‌কল শব্দে।

মাশুকাকে ওর গন্তব্যে পৌঁছতে লেগেছিল অনেকক্ষণ। পাহাড়ি পথের এতটা চড়াই এই প্রথম পাড়ি দিচ্ছিল মেয়েটা। ওদের মতো তো অভ্যেস নেই। বেমানান পাহাড়ি পোষাকে ট্রেন থেকে নেমেছিল ও। সময় ভারি আজব। নির্বাসনেরও পোষাক পরিয়ে দেয়। তারপর পথে যেতে যেতে মাশুকা কুড়িয়ে নিচ্ছিল নির্বাসনের শর্তাবলী। নুড়ি পাথরের মতো অজস্র নিয়ম ছিঁড়িয়ে ছিল সেদিন পাহাড়ি পথটায়। তারাগুলো পরদা টেনে ঢেকে রেখেছিল নিজেদের। এটা ওদের সনাতন ভয়। কোনো নির্বাসিতকে দেখলেনই ওরা মুখ ঢেকে ফেলে কষ্টে। আসলে ওরাতো আলোর মতো সময়ে থাকে, সেই আলো মাপে কার সাধ্যি? তাই মাপ জোকের সময় গায়ে মেখে আসে যারা, তাদের দেখলে ওদের খুব কষ্ট হয়, লজ্জা লাগে...ওরা মুখ ঢাকে। অন্ধকার পাহাড়ি পথে মাশুকা হাঁটছিল, পিঠের বাড়িতে কাঠের বোঝা। নির্বাসিতদের নিজেদের জিনিস লোহার ছোট চাকা লাগানো কাঠের ঠেলাগাড়ি করে নিয়ে যেতে হত। মাশুকার ঠেলা গাড়িতে জিনিস কম ছিল, কিন্তু ওজন ছিল চৌগুন – দুটো গরম পোষাক। ঢাকা দেওয়া কাঠের বালতি দুটোয় একটায় ঠান্ডাজল, একটায় গরমজল। শেহেদ ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল নিয়ম। নিয়ম শুনে মাশুকা হাঁফাচ্ছিল...হাসছিল। হেরিং সাহেবের বিশাল বাংলোবাড়ির গেট পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল মাশুকাকে...শেহেদ। ওর কিন্তু তার এক পাকদন্ড আগেই নেমে আসার কথা। নেমে আসতেই গিয়েছিল, তখনই পাহাড়ি অন্ধকারে মৃদু হ্যারিকেনের আলোয় ও দেখেছিল মেয়েটার মুখ। কতগুলো কাটাকাটি খেলার দাগ ওর চোখে। সময় বড় বেশি খামখেয়ালী ছবি এঁকেছে ওর মুখে শ্বাসে – প্রশ্বাসে, এমন কি হাসিটাকেও বাদ দেয়নি।

২

সেই থেকে রোজ একবার হেরিং সাহেবের বাংলোর গেট পর্যন্ত এসে ঘুরে যেত শেহেদ। মাশুকা তখন কাজে বেরিয়ে যেত। নির্বাসনের শর্ত অনুযায়ী মাশুকাকে রোজ সকাল আটটার মধ্যে দো – তলা বাংলো বাড়ি ধোয়ামোছা করে নীচে নেমে যেতে হতো পাহাড়ি উপত্যকায়, কাজের খোঁজে। ওই জায়গাটাকে এখানকার মানুষ বলে চোহরাহে...চত্বর। সেখানে এক-এক জনের বরাদ্দে এক এক রকম কাজ জোটাতে হতো মাশুকাকে। কখনও তামাং দাজুর মুদিখানা সামলাতো, পরের মরশুমেই ওকে দেখা যেত জিনিবিবিদের আলুক্ষেতে। এমনকি তস্‌বির তবায়ফের সিলেট ক্ষেতেও হাড় ভাঙা খাটুনি খাটে মাশুকা। এভাবেই রুজি রুটি জোগাড় করত নিজের। ওদের দেওয়া পোষাক গরমজামা, লেপ এসবও রোজগার করতে হতো ওকে। চোহরাহে তাকে ছুটি দিত ওদের ঘুমের আগে আগে। আকাশের চাঁদটাও তখন পশমি কম্বল টেনে নিত গায়ে। শেহেদ রোজই নিঃশব্দে পিছু নিত। তামাং দাজু মাশুকাকে একটা বড়ো কালো ছাতা দিয়েছিল। সেটা মাথায় দিয়ে ঠেলা গাড়িতে জলের দুটো বালতি আর রোজগারের জিনিস নিয়ে লন্ঠনের মৃদু আলোয় মাশুকা চড়াই পার করছে। একদিন সাহস করে হেবিং সাহেবের বাগানের গেট টপকে বাংলোর দরজায় পৌঁছে গেছিল শেহেদ। তারপর থেকে রোজই। দরজায় টোকা দিত। অপেক্ষা করত। ফিরে আসত। মাশুকা কিন্তু দরজা খুলত না। শিরিনও খুব জেদী নদী যেখানে ও ভাববে সেখানেই বাঁক নেবে, বাঁকের ধারে দাঁড়ানো বিরহী বার্চ গাছটার দিকে দেখবেই না। বার্চ কিন্তু আজও শিরিনের জন্য অপেক্ষা করে।

মাশুকা তখন তসবির তবায়ফের মদের কারখানায় কাজ করছে। এত দিনে এখানকার প্রায় সব কিছুই ওর অভ্যেস হয়ে গেছে, শীতটা ছাড়া। শীতের মরশুম না থাকলেও মাশুকার সবসময় শীত করে, প্রচন্ড শীত...ও থর্‌থর্‌ করে কাঁপে। শেহেদ লক্ষ্য করত সব। তসবির বিবির ওখানে কাজের মেয়াদ কম হলেই ভালো। এতদিন সন্ধ্যার পর শেহেদ সবে পিছ নিয়েছে মাশুকার, হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তস্‌বির বিবি। হাতে নতুন হ্যালোজেন আলো...চাঁদনী রাতের মতো তার পোষাক। শেহেদের ডান হাতটায় একটা আঙড়ি ধরিয়ে দিয়েছিল। ভীষণ ছ্যাঁকা খেয়েছিল শোহেদ। তস্‌বির বিবি নিঃশ্বাসের দূরত্বে তাকে টেনে এনে বলেছিল,
-এটা নিয়ে যা। ওর শীতের মেয়াদ যাতে আর বাড়ে...।
শেহেদ বার্চ গাছটার মতোই বুরবক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার জন্য মাশুকার নির্বাসনের মেয়াদ বেড়ে যাবে। মেয়েটা আরও কত কত শীত পেরোবে। তসবির বিবি অনেক দূর অব্দি খবর পাঠাতে পারে। ওর হ্যালোজেনের আলোর মতো। তবুও শেহেদ সেদিন আঙড়িটা নিয়ে গিয়েছিল মাশুকার কাছে। মেয়েটার শীত কষ্ট আরও বেড়েছে। ইতিমধ্যে ওর ববাদ্দের তিনটি লেপের একটা বাতিল হয়ে গেছে – ও কাজ করতে করতে কথা বলছিল, তা-ও শিরিনের সঙ্গে। এখনও বলছে। ওর হাতের চেটোতে রাখা একটা অদ্ভুত রঙের শামুকের খোল। ওটা একটা কালো কারে তাবিজের মতো গলায় বেঁধে রাখে মাশুকা, শামুকটা নাভি ছুঁয়ে থাকে...এত লম্বা তাবিজ এর আগে কোথাও দেখেনি

শেহেদ। মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। মাশুকার নাড়ী কাটা হয়নি, হয়তো ভুলে গেছে, হয়তো ওই শামুকেই নাড়ী নিয়ে ঘুমোচ্ছে ওর অসমাপ্ত ভ্রূণ। কেশর রঙের শামুকের খোলটা ঋতুবদলে রঙ বদলাতো বোধহয়- সেদিন রাতেও মাশুকা ওর নাড়ীর শামুকখোলের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল। কখনও করতলে ওকে ধরে কখনও আলতো করে কানে চেপে ধরছিল...কাচের শার্সির বাইরে থেকে বিমূর্ত সম্পর্কটাকে সেদিন আবিষ্কার করেছিল শেহেদ। কী আশ্চর্য। সেদিন একটা টোকা মারতেই দরজা খুলেছিল মাশুকা। রোজকার মতো গরম জামা পরেও কাঁপছিল অসম্ভব। ইংরেজের বাংলোয় ফায়ার প্লেস ছিল। কাঠের বোঝা ভিজে যাওয়ায় জ্বলছিল না। শেহেদ মাশুকাকে আঙড়িটা দিয়েছিল সাবধানে। মাশুকা কী যেন একটা বলতে চেয়েছিল শেহেদ শুনতে পায়নি বাইরের কেউ বোধহয় শুনেছিল। শেহেদ ওর বাঁ হাদের তর্জনিটি মাশুকার ঠোঁটের ওপর চেঁপে ধরেছিল...শেহেদ যে কোনো দিন চায়নি শিরিনের ওপর বাঁধ তৈরী হোক। ভুলে গিয়েছিল শেহেদ, এখানে মাশুকা নির্বাসনে আছে। রজি রুটি ছাড়া আর কোনো ধরনের সম্পর্কে ও জড়াতে পারবে না। রুটি খিদে মিটিয়ে, আগুন শীত কমানোর ব্যর্থ চেষ্টায় ওর মধ্যে যেটুকু উষ্ণতা দেবে, তার বাইরে আর কোনো উষ্ণতা তার প্রাপ্য নয়। মালিক –মালকিনদের নির্দেশাবলীর বাইরে আর কোনও কথা তার শ্রুতি গোচর হলে শাস্তি অনিবার্য। হলোও তাই। মাশুকার শ্রমদানে সময় বেড়ে বারো ঘন্টা হলো। কর্মস্থল বদলে হলো ফাদার লিয়নের দরিদ্র চার্চের পাশের হাসপাতালটা চোহ্রাহে পেরিয়ে উপত্যায়্য নাভিমূলে পুরনো গির্জাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই হাসপাতাল থেকে শিশুকন্ঠের কান্নার শব্দ শুনেছিল মাশুকা।

৩

ফাদার লিয়নের হাসপাতালে মাশুকা কাজ শিখেছিল মন দিয়ে। কুড়ি ঘর গ্রামের আনুপাতিক হাসপাতাল।রুগীর সংখ্যা হাতে গোনা। শিশু রুগীই বেশী। হাসপাতাল আর চার্চের মাঝখান দিয়ে চেতনার মতো শান্ত শিরিনের বয়ে যাওয়া। ফাদার লিয়ন বলতেন, শিরিনের ওপর ছোট্ট কাঠের সেতুটাই নাকি ওকে শান্ত করে রেখেছিল। সেতু না থাকলে ঈশ্বর নাকি নারী হতে পারেন না। বাচ্চাগুলো সুস্থ হয়ে চার্চের চারপাশে মরশুমী ফুলগাছ পুঁতে দিয়ে আসত। সেতুটার ধার ঘেঁষে একটা চিনার গাছ ছিল। সে গাছে ফুল ফুটতে দেখেনি কেউ কোনো দিনও। ফাদারও না। মরশুমী ফুলগাছ গুলো পাতায় পাতায় বেড়ে উঠত, কুঁড়ি আসতে না আসতেই রূপালী বরফের গুঁড়ো ঢেকে দিত সব। মাশুকার কাজ ছিল বারো ঘন্টার। সে থাকতো ষোলো ঘন্টা। সময়ের দেশ থেকে সনদ এসে চার্চের সিঁড়ি হেরিং সাহেবের বাংলোর বারান্দা ভরিয়ে দিত রোজ সন্ধ্যায়। রাত পোহাতেই আর একটা সনদও খুঁজে পাওয়া যেত না কোথাও। একমাত্র শেহেদ জানত ওগুলোকে মাটি কুপিয়ে কবর দিত মাশুকা। কবরের ওপরে গাছের চারা বেড়েই চলত সংখ্যায়। ঝর্ঝরে সাইকেলটা নিয়ে রোজ একবার সেতু পার করত শেহেদ। কথাটা সে বলেছিল আম্মিকে। আম্মির হাতে তখন হিমসিম খাওয়া সংসার। তারই গলিঘুঁজিতে লুকিয়ে রেখেছিল উত্তরটা – মুখের কথা মনের ভাষা চিনার গাছটার মতো হয়ে য়ায়...ফুল ফোটানো সুবাস ছড়ায় না, শুধু নুড়ির মতো অগোছালো হয়ে পড়ে থাকে। মাশুকার নির্বাসনের মেয়াদ তখন অনেক বেড়ে গেছে। ফাদার নিয়ন বোধহয় তাতে খুশিই হয়েছিলেন। সবাই-ই তো সতু চায়। শীতের নাকছাবি পরেনি তখনও তাদের পাহাড়ের প্রনয়িনী পাহাড়টা। আচমকাই চির অপরিচিত ঝড় উঠল একদিন দুপুরে। ব্রহ্মান্ডের দুঃসময় আকাশ থেকে হু হু করে নেমে আসতে লাগল তাদের উপত্যকায়। একটা তিনমাসের শিশুকে বুকে জড়িয়ে নেমে এসেছিল মাশুকা। ততক্ষণে হাসপাতালের একদিকের কাঠের দেয়াল ভেঙে পড়েছে। ছাউনিটা স্বর্গায়ত দেবদূতের শাপমুক্তির মতো কোথায় যেন উড়ে গেল। কুড়ি ঘর লোক চার্চের পরিসরে বাঁচতে জমা হয়েছিল। শেহেদ পরে দেখেছিল ওরা সবাই অসুস্থ শিশুগুলোকে বাঁচাতে কীভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সেতুবন্ধন করছে। শেহেদ নিজেও ছিল সেই ঝড়ে। ওরা সবাই তখন ব্যস্ত। মাশুকার নিস্তব্ধ কোলে ক্রমশ নীল হয়ে আসা তিনমাসের শিশুটা নিঃশ্বাস ভুলছে ধীরে ধীরে। ফাদার অনেক চেষ্টা করেও বাড়তি নিঃশ্বাস যোগান দিতে পারছিলেন না ওকে। ক্রমশ কমে আসছিল ফাদারের নিজের শ্বাসবায়ু। স্খলিত পায়ে ছুটে গিয়েছিলেন যীশুর কাছে। শেহেদ দেখেছিল তখন মাশুকাকে। নীল হয়ে আসা ওই শিশুটির নাভিতে ও ছুঁইয়ে রেখেছিল ওর কেশরী রঙের তাবিজটা – শামুকের খোলে ভরে দিচ্ছিল বাঁচিয়ে তোলার বিমূর্ত সতেজ বিশ্বাস। স্থির চোখে নিঃশ্বাস দিচ্ছিল তাঁর নিস্তব্ধ কোলের নীল কুড়িটাকে। তখনই তস্বির বিবির চিৎকারে ওরা চমকে উঠেছিল। ফাদার লিয়ন আর চোখের পাতা খুলতে পারছেন না। মাসুকা সম্মোহিতের মতো বাচ্চাটাকে কোলে করে উঠে গিয়েছিল। ওকে বুকে জড়িয়ে বসেছিল ফাদারের পাশে। কী অদ্ভুতভাবে ফাদারের শেষ হয়ে আসা শ্বাসবায়ু শামুকটার খোলে নিয়ে ভরে দিচ্ছিল শিশিটুর মুখে-চোখে-নাকে। চির অপরিচিত ঝড়ের সঙ্গে সেতু পার করলেন ফাদার লিয়ন। শিরিনের চোখের জল তাঁর প্রশান্ত মুখখানিকে বড় শান্তি দিয়েছিল সেদিন। হাসপাতালের পাশে কবর দিতে যাচ্ছিল তারা।

পাদার লিয়নের কবর। তখনই সবাই দেখেছিল এই উপত্যকার রূপকথাটাকে- চিনার গাছের নীচে বসে থাকা মাশুকার কোল থেকে ভেসে আসছে খিল্ খিল্ হাসির শব্দ – গাছটা ভরে রয়েছে সাদা ফুলে, তারই সুবাসে বুঝি বেদিশা হয়ে চার্চের চারপাশের পাতায় ঢাকা মরশুমী গাছগুলো কোন এক অজানা ঋতুর মাতোয়ারা গন্ধ পেয়েছিল, সেদিন একে একে ফুটে উঠেছিল কুঁড়িগুলো। আকাশ – পৃথিবী একসঙ্গে তারা ফুটিয়ে তুলেছিল সেদিন। তাদের উপত্যকায় আকাশে এত তারা আর কখনও দেখেনি শেহেদ। মাশুকা সেতুটাকে আগলেছিল। বুঝি বুক দিয়ে। উপত্যকার কুড়িঘর মানুষের উষ্ণতায় ওর চোখের একটাও মুক্তো হারিয়ে য়াযনি সেদিন। নিঃশব্দে একটা একটা করে খসে পড়ছিল ওর নাভির শামুকের খোলে। ওই একদিনই সময়ের দেশ শামুকার হদিশ পায়নি। এত তারা – এত ফুল ... এত সুবাস... জায়গা কোথায় ছিল খবর দেয়া নেওয়ার।

৪

শীতের মরশুম শুরুহয়ে গেছিল। মাশুকার চার্চ – হাসপাতালের কাজ ফুরিয়েছে। সনদ এসেছে চাকরি বদলের। এবার ওকে শিখতে হবে ভেড়ার লোম থেকে উল তৈরীর কাজ। শিখল মাশুকা। শিখল নিত্য নতুন রঙের লোম থেকে উল তৈরী করতে। শিরিনের ও এ সময়টায় ভারী শীত করে। ওর জন্য রামধনুর সাত রঙে একটা লম্বা মাফলার তৈরী করল ও। শিরিন ভারি লজ্জা লেপ তাতে। মাশুকাই বোঝে শিরিনের লজ্জা। তাই বার্চ গাছটার ডালে ডালে জমা বরফের কুঁচি ঝরিয়ে দিয়ে রামধনু মাফলার পরিয়ে দিল বার্চের ডালে। এতদিনে শিরিশের সঙ্গে বার্চের মালাবদল হলো। তসবিরবিবি উপহারে রুপোর নক্সাকাটা একটা আয়না দিল। বার্চের ডালে ঝুলতে থাকা সেই আয়নায় সব সময় দেখা যায় শিরিনকে। তামাং দাজুর জন্য বুনে দিল মখমলি সাদা সোয়েটার। তস্‌বির বিবিকে দিল চেরী রঙের একটা পশমিনা। সেই শীত বিদায় নিতে একটু বেশিই সময় নিয়েছিল, সইল না তস্‌বির বিবির। পাশমিনার কারকার্যের মধ্যে দিয়ে একটু একটু চুঁইয়ে পড়েছিল চাঁদের হিম। খুব বরফ পড়েছিল সেদিন, কবর খোঁড়ায় হাত লাগিয়েছিল মাশুকা। ওর মুখ, ঠোঁট, চোখের দৃষ্টি বরফের মতোই সাদা হয়ে গেছিল। এত শীত, তবু আদেশনামায় কবর খুঁড়তে বলা হয়েছে ওকে। হাতে দস্তানাটা অব্দি পরতে পারেনি। মাঝে মাঝে হাঁফ ধরে যাচ্ছিল ওর। হাত অবশ হয়ে আসছিল। শেহেদ দেখছিল ওর নাভির তাবিজটাকে দু-হাত জড়ো করে চেপে ধরছে, যেন ওর সমস্ত উত্তাপ ওখানে কোনো এককালে রেখেছিল ও। মাঝে মাঝে মুখের কাছে নিয়ে শ্বাস নিচ্ছিল লম্বা করে...মাশুকার প্রাণভোমরা বুঝি ছিল ওই কেশরী রঙের শামুকের খোলে। শীতের শুরুতে মাশুকা ওর এই তাবিজটার জন্য অদ্ভুত পশমী ঝালর তৈরী করে দিয়েছিল, নানা রঙের পশমি ঝালরে ঢেকে রাখত ওর নাভিমূলের তাবিজটাকে, পাখি যেন ডানা দুটো দিয়ে তার শাবককে আগলে রাখে বরফের মরশুমে সেই ভাবে আগলে রাখে মাশুকা তার তাবিজটাকে। কত রকমের রং যে খুঁজে বার করত ও। তাবিজের পশমী ঝালরকে পরিয়ে দিত শেহেদের অদেখা রদ্দুরের হলুদ, কখনও শিরিনের জলের মতো শার্সি রঙের পশম, খুঁজে বার করতো সন্ধ্যার গন্ধ বয়ে আনে যে সবুজ ঘাস, তার রঙটাকে নিঃশব্দে তুলে নিত পশমে, কুয়াশার গায়ে হাত বুলিয়ে বুঝি রঙের রঙঘরের খোঁজ পেয়েছিল মাশুকা...রঙ দিয়েই বুঝি ওর তাবিজের শীত আটকাতে মাশুকা, পাখির ডানার উত্তাপে রাখত তার আপত্য তাবিজকে।

শেহেদের উপত্যকায় মৃত্যুশয্যা সাজানো হত মৃত্যুর আগেই। যাত্রী বহু আগেই বলে যেত তার কবরসজ্জার কেমন হবে। তস্‌বির বিবিও বলে রেখেছিল তার চেবী পশমিনার ওপর যেন চারটে নক্সাদার রূপোর আরশী রাখা হয়...ও যেন ঋতুবদলের খবরটা পেয়েছিল চাঁদের হিম বুকে জড়াতে। তস্‌বির বিবির কবরের ওপর সেই চারটে আয়নায় আকাশ থেকে বুঝি রোজ একটা করে ইচ্ছে খসে পড়ে। গ্রামের কেউ না কেউ পড়তে পারত ইচ্ছেটাকে। একদিনে একজনের বেশি কাছে যেতে দিত না তস্‌বির বিবির ইচ্ছেরা। শোহেদ সব থেকে বেশি বার পৌঁছাতে পেরেছিল সেইসব আরশী ইচ্ছের কাছে। তস্‌বির বিবি মরতে মরতেও তামাশা করে গেছিল শেহেদের সঙ্গে। এক পূর্ণিমার রাতে তামাং দাজুর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের আয়োজন করতে করতে মাশুকা প্রায়ই রাত গভীর করে ফেলেছিল। শীতে তার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। কাজ করতে সময় লাগে বেশি, চোখের কুয়াশা কাটিয়ে। বিয়ের রাতে চাঁদের আলো দেখা দেবার আগেই ওকে ফিরে যেতে হবে হেরিং সাহেবের বাংলোয়। ওর নামে পরোয়ানা এসেছিল, মৃতবৎসা মাশুকা শুভ অনুষ্ঠানে থাকতে পারবে না। শেহেদ আবাক হয়ে ভেবেছিল সেদিন, সময় এর দেশে অযুত সময়ের ছড়াছড়ি, রাজা বাদশার মতো ভান্ডারে ভান্ডারে সময়ের অমূল্য সম্পদ। তবু সে দেশে সময় পাশে দাঁড়ায়নি মাশুকার। বৈরী হয়ে দুঃসময়কে পাঠিয়েছে ওর পাশে। পাকদন্ডী দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল মাশুকা। নির্বাক তাবিজটাকে জড়িয়ে ধরে। শেহেদ যাচ্ছিল ওর পাশে পাশে। দুঃসময়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে। বলছিল তাদের উপত্যকার নানা কথা, সংস্কার। এখানে আঁতুর ঘরে য়খন শিশু জমায়, বাইরে বসে থাকা

মানুষগুলোর কানে পৌঁছয় ওর প্রথম কান্না তখনই আঁতুর ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে সাতজন দাইমা। ওদের দু-হাত ভরা থাকে নবজাতকের পুন্য রক্তে, পিচ্ছিল নাড়ীটি থাকে সবচেয়ে দুর্ভাগা মেয়েটির হাতে। তারপর ওরা য়ায় প্রণয়িনী পাহাড়ের গ্রস্থে, সেখানে আছে খোয়ার হ্রদ। এখানকার মানুষের কাছে সেই হ্রদই পুন্য প্রাণের আধার। সেখানে সাতটি নারী হাত ডুবিয়ে বসে আর দুর্ভাগা মেয়েটির ধীরে ধীরে নেমে যায় আবক্ষ জলে। ডুব দিয়ে নাড়ী পোঁতে লাল শৈবালের শিকড়ের কাঁছে। তখন ঘরে ঘরে মোমবাতি জ্বলে, সাতটি নারীর ওমে আলো ছড়িয়ে পড়ে, নবজাতকের আত্মার জাগরণ ঘটে সেই শুদ্ধ উষ্ণ আলোয়। বছর না ফিরতেই দুর্ভাগা মেয়েটির কোলে আলোর জন্ম হয় – দীর্ঘজীবী সে আলো। জিনিবিবির কোল আলো করে এভাবেই এসেছিল নুর। মাশুকা সেদিন ইফায়নি, অন্য কোনো পথে যেতে চাইছিল বোধহয়। হেরিং সাহেবের বাংলো বাড়িতে তাকে ঢুকিয়েছিল হাত ধরে। জিনপরীর মতো আঙ্গুলগুলো শীতে শক্ত হয়ে গেছে। শেহেদ ওর হাত ধরেছিল নিদ্বিধায়, নির্বাসনের মেয়াদ বাড়ার ভয় ওরা খোয়ার হ্রদে ফেলে এসেছিল।

৫

দীর্ঘদিন নিয়ম না মানায়, পশমের যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য মাশুকার দ্বিতীয় লেপটাও তুলে দিতে হয়েছিল সময়ের রেল গাড়িতে। বাইরে সেদিন মেঘলার মতো মেঘ, ইচ্ছের মতো বৃষ্টি। হেরিং সাহেবের ভাঙা দোতালা কাঠের বাড়িতে শীত কোনঠাসা করে ফেলেছে মাশুকাকে ফায়ার প্রেসের নিভন্ত আগুনের সামনে বসে ও কুরুশে ঝালর বোনে। তস্‌বিরবিবির গচ্ছিত দ্বিতীয় আঙড়িটা পৌছতে গিয়েছিল শোহেদ মাশুকার পাশে বসে বুনন দেখছিল সে একমনে। সারারাতি ওর পাশে বসে শীতের নিঃশব্দ শুনেছিল জেহেদ, গায়ে মেখেছিল শীত তীব্র ভালোবাসায়। ভোর রাত্রে শেহেদের হাতের চেটোয় আঙুল দিয়ে লিখেছিল মাশুকা ওর ছেলের নাম। হরফগুলোকে স্পর্শ করে শেহেদ চম্‌কে উঠেছিল। সেই আঙুলে লেখা অনাবিষ্কৃত লিপিতে ফুটে উঠেছিল, মাশুকার নির্বাসনে আসার আগের দিনগুলি। গোনাগুনতি ঠিক থাকবে বলে সময় সেখানে রক্ত দিয়ে সম্পর্ক তৈরী করে ভাঙে। রক্তে ভেসে যেতে যেতে মাশুকার হাত কাকে যেন ডাকছিল, সাড়া পাচ্ছিল না। য়খন পেত তখন ওর কান্নার শব্দে সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মানুকার ছেলে তার দেহে জন্মায়নি, আত্মা জন্মেছিল। সূর্যের মতো শুদ্ধ সেই আত্মজের স্পর্শ, স্পর্শহীন নিষ্কম্প আত্মার মতো সে বয়ে যেত মাশুকার মধ্যে বিশুদ্ধির চেতনা ছড়িয়ে, ওকে আলোকিত করে – ওর নাম রেখেছিল আদিত্য, মৃতবৎসা মাশুকা। মৃত্যুকে জন্ম দিতে গিয়ে মাশুকা ওকেই ছায়ায় ঢেকে ফেলত বার বার...ওর উত্তাপ বুঝতে না পেরে চিৎকার করে কাঁদত, চিৎকারে বাক্‌রোধ করে দিয়েছিল আদি আত্মজের। এজলাসে ছত্রিশটা বয়ানে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল মাশুকা, তার ছেলেটা নীরব হয়ে গেল নাকি আত্মিক সংঘর্ষে। আশঙ্কাটা আমূলক নীরব হয়ে গেল ছিল না, থাকার কথাও নয়। আদিত্য তখন শামুকের খোলে শীতল নির্লিপ্তির মধ্যে নিরুদ্দেশ হচ্ছে মা তার আত্মার উত্তাপটুকুকে নিজের শীতলতায় ডুবিয়ে ফেলেছে...তাকে উত্তাপ সংগ্রহ করতে হবে সূর্যের মতো, তাই তো সে আদিত্য। নির্বাসনে আসার পূর্ব মুহূর্তে তার একটা ইচ্ছাপূরণ করতে দেওয়া হয় – সে এই শামুক খোলটা নিয়ে আসে তাবিজের মতো গলায় বেঁধে, নাভিমূল স্পর্শ করিয়ে – তার আত্মজ সেইখানেই থাকে। নৈঃশব্দের ভাষায় কথা বলে, বুঝতে পারে মাশুকা। কত কী বলে। আদি নিরুচ্চারে, বায়না করে, অভিমান করে, সুন্দর সুন্দর গল্প শোনায় ওর নিরুদ্দেশের দেশের। কী একটা পাখির নাম বলেছিল মাশুকা, সেই পাখির সঙ্গেই নাকি বিয়ে দেবে ওর ছেলের। ওই পাখিটা রদ্দুর ভালোবাসে, আলোতে চান করে – তাই ওকে এত পছন্দ মাশুকার। শেহেদ নিষ্পলকে দেখছিল কীভাবে মাশুকা পক্ষীরাজে সওয়ার করিয়ে তার ছেলের বিয়ে দিচ্ছে। ওর চোখ থেকে আলো নিয়ে ঝরে পড়েছিল সাতটা মুক্তো। সবকটা কুড়িয়ে শেহেদের হাতে দিয়েছিল মাশুকা, প্রথম ডেকেছিল ওর নাম ধরে...ভেজ কাচের মতো ওর গলার স্বর। বলেছিল,

-ও আসবে একদিন। নিজেই নেবে নির্বাসন। ওকে ওই আলোর ফোঁটাগুলো দিও শোহেদ।

ভোর রাত পাড়ি দিয়ে এক পয়গম্বর যেন সেই সকালটা নিয়ে এসেছিল। বৃষ্টির কণায় কণায় রোদ্দুরের রঙ চিনেছিল শোহেদ সেদিন। দেখেছিল বিশাল কালো ছাতা মাথায় নিয়ে বংলোর পেছন দিকে চলেছে মাশুকা। ডাকছে তাকে নাম ধরে, এতদিন ধরে জগতের সব রঙ ঢেলে ফুলের বাগান সাজিয়েছে মাশুকা। ফুলেদের সঙ্গে অভ্যেসমতো গল্প করে যাচ্ছে, শিরিন যেমন গল্প করে ঘাসফুল, লতাপাতা আর রঙিন জল-নুড়িদের সঙ্গে শোহেদকে কাছে ডেকে শামুকের খোলটা কানে চেপে ধরল...বার্চ গাছটার মতো রামধনু হাতে হাতে শুনতে পেয়েছিল কিছু...মাশুকার গলা না তার আত্মজের বুঝতে পারা যাচ্ছিল না... ওরা নিরুচ্চারে মিলেমিশে গেছে। বৃষ্টিতে ভিজে যেতে যেতে বলে গিয়েছিল সেবারের বিদায়ী শীত...বলে ছিল রোদ্দুরের ভাষায়...কষ্টকে ভালোবাসলে এরকম ফুল ফোটে মরশুমে মরশুমে...ঋতুবদল হয় আলোর উৎসব নিয়ে ...শোহেদের চোখ জুড়ে তখন মাশুকার উপত্যকা...আত্মজকে লালন করে মাশুকা উপত্যকা জুড়ে সাত-সাতটি রামধনু ফুটিয়েছিল সেদিন।

আঙড়ি দুটো হাতে নিয়ে নেমে আসছিল শেহেদ। পাকদন্ডীর উৎরাই পথ তাকে নিয়ে গিয়েছিল তস্‌বির বিবির কবরের কাছে। ইচ্ছে-আরশীতে দেখেছিল কুড়ি বছর পরের একটা মুখ...মাশুকার আত্মজের আদল...সময়ের গিনতি – হিসাবে রক্তের নয়, আত্মার ওমে সে পেয়েছে মাশুকার মুখের আদল। তস্‌বির বিবির কবরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল বুঝি শেহেদ। বলেছিল, -মাশুকার আর শীত করবে না বিবি।

কুড়ি বছর পর বুঝি সময়ের দেশ থেকে ট্রেনটা আসল। পৃথিবীর ভাবী মানচিত্রের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে সে ভিজতে ভিজতে তারা – খসা শেডটার নীচে দাঁড়াল। হাত রাখল ঝর্‌ঝরে সাইকেলটায়...শোহেদ দেখল, পলেস্তরা খসা ছোট লাল ইঁটের প্ল্যাটফর্ম জুড়ে সোনালী রোদ কেশরী মেখে লুকোচুরি খেলছে...তারই মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসল ছেলেটা। পকেট থেকে সাতখানা আলোর ফোঁটা ওর হাতে দিতে গিয়ে দেখল শোহেদ আহ্‌মেদ, তার মাশুকার গল্পের শেষ পাতটা রোদ্দুর রঙের ছেলেটার চোখে।